গৌতম বসু

কবীর

'রহিগো পন্থ থকিত ভো পবনা, দসৌ দিসা উজর ভো গবনা।'— রমৈনী ৪৫ (অংশ)
সমুখে রয়েছে পথ ফুরাল যাত্রীর শ্বাস, দশটি দিশায় হায় ভেঙেছে নিজের বাস।

কাশী শহরের কত বয়স, কেউ জানেন না। প্রাচীন বিশ্বে, বিভিন্ন সময়ে, নানা স্থানে, নানা শহর গড়ে উঠেছিল, সে-কথা আমরা সকলেই জানি; কী বিচিত্র ও সুন্দর সেই সব নাম— ব্যাবিলন, নিনিভে., বাইসান্টিয়াম, এবং তার কিছু পরে, দামাস্কাস, অ্যাথেন্স, জেরুসালেম, রোম! ব্যাবিলন এবং নিনিভে. অবলুপ্ত, বাইসান্টিয়াম-এর এখনকার নাম ইস্তানবুল। কাশী শহরের দুটি নাম, কাশী এবং বারাণসী। ব্যাবিলন অথবা নিনিভের মতো অত পুরোনো না হলেও, কাশী অতিপ্রাচীন এবং আজও জীবন্ত এক শহর। এমন সব গল্প তাকে ঘিরে রয়েছ যে, লিপিবদ্ধ ইতিহাসকে পিছনে ফেলে বারাণসী যেন আরও দূর অতীতে গল্পের ভুবনে মিশে গেছে। যেমন ধরো, এই গল্পটি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ; কৌরবরা কেবল পরাজিতই নয়, সম্পূর্ণ নিঃশেষিতও। কৌরবদের অথবা পাণ্ডবদের পক্ষে লড়তে যে-রাজন্যবর্গ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছিলেন, তাঁরাও প্রায় সকলেই নিহত, যে-ক'জন তখনও বেঁচে রয়েছেন, তাঁরা যে যার রাজ্যে ফিরে গেছেন। পঞ্চপাণ্ডব এতদিনে বুঝতে পেরেছেন যে, বিজয়গৌরব মিথ্যে, নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নরহত্যার পাপের বিপুল ভার তাঁদের আজ নিজেদের মাথায় বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। এ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত কী ভাবে হতে পারে? এত বড় পাপ আদৌ ক্ষমা করা যায় কি? তাঁরা ভাবতে লাগলেন, ভেবে-ভেবে কুলকিনারা না পেয়ে, মুনি-ঋষিদের জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরাও এক কথায় এ-প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। অনেক আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো গেল যে, সত্যিই, এত প্রাণহানি ক্ষমার অযোগ্য, তবু, মহাদেবের পায়ে গিয়ে পড়ে উদ্ধারের একটা শেষ চেষ্টা করা যেতে পারে। অন্যের এত পাপ ধারণ করতে পারেন একমাত্র নীলকণ্ঠ, যদি তিনি চান। মহাদেব তখন অন্নপূর্ণার সঙ্গে কাশীতে বসবাস করছেন, সেইজন্য আর কাল বিলম্ব না করে পাণ্ডবরা কাশীর পথে রওনা হলেন। মহাদেব দিব্যদৃষ্টির অধিকারী; তিনি দেখতে পেলেন পাণ্ডবরা ক্ষমাভিক্ষা চাইতে তাঁর কাছেই আসছেন। এবার তিনিই ভয় পেয়ে গেলেন, কারণ এত পাপ ধারণ করার ক্ষমতা যে তাঁরও নেই! কাশী ছেড়ে তিনি উত্তরপূর্ব দিশায় পালালেন! হৃষীকেশ

অঞ্চলে এসে, গঙ্গা পার হয়ে, মহাদেব প্রবেশ করলেন পার্বত্যপ্রদেশের গভীর অরণ্যে এবং সেইখানে লুকিয়ে রইলেন। আজ সেখানে পাতলা হয়ে আসা জঙ্গলের গা বেয়ে, পাকা রাস্তা উঠে গেছে। জায়গাটার নাম গুপ্তকাশী।

কাশী শহরটি কত পুরোনো সেটা বলবার জন্য এই গল্পটা শুরু করেছিলাম। অন্য কোনো দিন গল্পখানা শেষ করা যাবে; আমাদের আজকের গল্প মহাদেবকে নিয়ে নয়, এমনকী পাণ্ডবদের মতো রাজারাজড়াদের নিয়েও নয়, আমাদের আজকের গল্পের বিষয় কাশীবাসী এক দরিদ্র তাঁতি পরিবারের সন্তান, কবীর জোলা। নিজের মতো করে তিনিও তাঁর সময়ের, অর্থাৎ মধ্যযুগের ভারতবর্ষের এক কিংবদন্তী, যাঁকে ঘিরে অগণিত বাস্তব ও অবাস্তব গল্প গড়ে উঠেছে। তাঁর ব্যক্তিজীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় তথ্য আমাদের সামনে নেই, যেমন, আমরা আজও তাঁর জন্ম ও মৃত্যুসন সঠিকভাবে জানি না, কেউ বলেন তাঁর জন্ম ও তিরোধান যথাক্রমে ১৩৯৮ ও ১৪৪৮ খ্রিস্টাব্দে, কেউ বলেন ১৪৪০ ও ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে। আমরা এও জানি না, তিনি জন্মসূত্রে মুসলমান ছিলেন, না নিরু ও নিমা নামের এক মুসলমান দম্পতি তাঁকে কুড়িয়ে এনে প্রতিপালন করেছিলেন। অথচ, আজ, তাঁর তিরোধানের সাড়ে পাঁচশো বছর পর, তাঁর সংস্কারমুক্ত ও বিদ্রোহী চিত্ত, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান, তাঁর রচিত দোঁহা ও অন্যান্য সাহিত্যকর্ম, তাঁর সত্যদর্শন, তাঁর সহজ, সরল, দিব্যজীবনই তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় হয়ে উঠেছে। তাঁর মৃত্যুকাল যখন উপস্থিত, তখনকার একটি ঘটনা থেকে তাঁর সংস্কারমুক্ত মনের একটা ধারণা করা যায়। কবীর সারাজীবনই কাশীতে কাটিয়েছিলেন, এবং কে না জানে, হিন্দুধর্মাবলম্বীদের কাছে কাশী এক মহাতীর্থ, সেখানে মরণ হলে স্বর্গলাভ সুনিশ্চিত। যতগুলি সুলক্ষণ কাশীর, তার চেয়েও বেশি কুলক্ষণ, দু-শো কিলোমিটার উত্তরে, গোরোখপুর-এর কাছে অবস্থিত মগ্‌হর্‌ নামের এক জায়গার। মানুষের বিশ্বাস, সেখানে মৃত্যু হলে নাকি নরকবাস অবধারিত, এবং শুধু তা-ই নয়, নরকযন্ত্রণা ভোগের পর পুনর্জন্ম হলে, মানুষ গাধা হয়ে জন্মাবেই। নিজের মৃত্যুর জন্য কবীর এই স্থানটিই বেছে নিয়েছিলেন! কুসংস্কারে অন্ধ হয়ে যাওয়া হিন্দুধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশে এই ছিল কবীর-এর কুঠারাঘাত:

সবহী ভূমি বনারসী, সব নীর গঙ্গা হোয়।
জ্ঞানী আতম রাম হ্যায়, জো নিরমল ঘর হোয়।।

অর্থাৎ, 'সব জমিই বারাণসী, সব জলই গঙ্গাজল। গৃহ নির্মল হলে, জ্ঞানীর সবখানে রাম।'

গোঁড়া ইসলামধর্মাবলম্বীদের প্রতিও তাঁর একইরকম নির্ভীক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সব ধর্মেই ভিক্ষাবৃত্তিকে একটা উঁচু স্থান দেওয়া হয়ে থাকে, ধরেই নেওয়া হয় সংসারত্যাগের ও কৃচ্ছ্রসাধনের এটি একটি অনুসরণযোগ্য পন্থা।

কবীর এর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি নিজে একজন শ্রমজীবী, কাপড় বুনে তাঁর দিন গুজরান হত। তিনি খুব স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন যে ভিক্ষাবৃত্তি তার আদর্শবোধের জায়গাটা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে আলস্যের ও অকর্মণ্যতার আশ্রয়স্থলে পর্যবসিত হয়েছে। কবীর বলেছেন:

মাঙ্গন মরণ সমান হ্যায়, মত কোই মাঙ্গো ভীখ।
মাঙ্গন সে মরিবো ভলো, য়হ সদ্‌গুরু কী সীখ।।

অর্থাৎ, 'ভিখমাগা মরণসমান, হাত পেতো না কেউ। ভিখের চেয়ে মরণ ভালো, বলেন সদ্‌গুরু।'

২
কবীর-বাণীর তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য

কবীর-বাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এই সংক্ষিপ্ত রচনায় তুলে ধরা তিনটি কারণে কঠিন — এক, এর পিছনে যে তত্ত্বকথা লুকিয়ে রয়েছে সেগুলি খুবই দুরূহ; দুই, অতুলনীয় হলেও, কবীর একা নন, তিনি এক বিশেষ ভাবধারা, ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলনের একজন অন্যতম প্রধান প্রতিনিধি, এবং, তিন, তাঁর ওপর ইসলামধর্মের মরমিয়া প্রশাখার প্রভাব, যা কবীর-বাণীর মতোই দুরূহ।

প্রথমত, কবীর-বাণীর দুরূহতা। এ-প্রসঙ্গে আমরা এখানে একটিই প্রসঙ্গ উত্থাপন করব। তাঁর রচনায় 'উলট্‌বাঁসী' নামের একটি ধারণা ফুটে উঠতে দেখা যায়। সাধকের জীবন সম্পর্কে তিনি বলছেন, 'আমি দেখলাম একটা নৌকোর মধ্যে নদী ডুবে যাচ্ছে।' এই বাক্যটি পড়লে আমাদের মনে হয় একটা উল্টো কথা লেখা রয়েছে, নয় কি? নদী তো কখনোই নৌকোয় ডুবে যেতে পারে না, তাই না? কবীর কিন্তু আসলে, উল্টো নয়, একটা সোজা কথাই বলছেন। তাঁর বাক্যে নিহিত অর্থ এইরকম: সাধারণ অবস্থায় মানুষ এক নৌকার মতো, সংসারের নদীতে সে ভাসমান। সাধকের জীবন অন্যরকম, তিনিও নৌকার মতো সংসারের নদীতে ভাসছেন, কিন্তু এমনই গভীর তাঁর আত্মজ্ঞান যে, নদীর সমস্ত জল, অর্থাৎ সারা সংসার, তাঁরই মধ্যে ডুবে লীন হয়ে যাচ্ছে! আমরা এখানে একটি সহজ দৃষ্টান্ত তুলে ধরলাম। 'বীজক' নামক সংকলনগ্রন্থে এমন অনেক 'উলট্‌বাঁসী' আছে, যা এতই দুরূহ যে টীকাকারের ব্যাখ্যা পড়ে বোঝা ছাড়া তার মর্মার্থ উদ্ধার করা দুঃসাধ্য।

দ্বিতীয়ত, কবীর ছিলেন গুরু রামানন্দ-র বারোজন শিষ্যের মধ্যে অন্যতম প্রধান শিষ্য। 'রাম' নামকে কবীর বীজমন্ত্র মানতেন, অনেকে মনে করেন এই 'রাম' আমাদের সর্বজনপরিচিত পুরাণের শ্রীরামচন্দ্র নন, তিনি কবীর-এর গুরু রামানন্দ। প্রসঙ্গত, রামানন্দর মানবধর্ম পালনের কোনো তুলনা হয় না, তাঁর বারোজন প্রধান শিষ্যের

মধ্যে কবীর ছাড়াও বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় কয়েকজনের নাম: রবিদাস (বৃত্তি-চামার), সদ্না (বৃত্তি-কসাই), ধন্না (বৃত্তি/জাত-জাঠ), গঙ্গা নামের এক নারী (বৃত্তি-যৌনকর্মী) প্রমুখ। অষ্টম শতক থেকে একাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে, সনাতন হিন্দুধর্ম ও অবক্ষয়ী বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধাচারী ভক্তি আন্দোলনের চিহ্ন প্রথম দেখা যায় দক্ষিণ ভারতে। এর মূল বৈশিষ্ট্য দুটি, সংস্কৃত ভাষা পরিহার করে তামিল ভাষার ব্যবহার এবং ধর্ম ও সামাজিক বৈষম্য প্রভৃতি বিষয় ঘিরে অব্রাহ্মণদের মতপ্রকাশ। যোগাযোগব্যবস্থা দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সে-আন্দোলন স্বতন্ত্রভাবে ভারতের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তিদের কয়েকজন হলেন; পূর্বাঞ্চলে শ্রীচৈতন্য, শঙ্করদেব; উত্তর-মধ্যাঞ্চলে রামানন্দ, কবীর, রবিদাস, তুলসীদাস; উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গুরু নানকদেব, বল্লভ আচার্য, সুরদাস; এবং পশ্চিমাঞ্চলে মীরা দাসী, তুকারাম, নামদেব, একনাথ, নরসিং মেহতা প্রমুখ।

তৃতীয়ত, মরমিয়া ইসলামধর্মের প্রভাব। সুদূর পারস্য থেকে আজকের দিনের আফগানিস্তান পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে মরমিয়া ইসলামধর্মের যে-ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল, সেটিও ভারতীয় চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে। সুফিধর্মের নিরাকার, অজর ও সর্বত্রবিরাজমান ঈশ্বর, ভক্ত ও ভগবানের অভিন্নতা, 'এবাদত'-এর অর্থাৎ উপাসনার বিভিন্ন স্তর, 'ফানা', মানুষে-মানুষে অভেদ প্রভৃতির ধারণার সঙ্গে মরমিয়া হিন্দুধর্মের সম্পর্ক এত নিবিড় যে, ধারা দুটি একে অপরের সঙ্গে মিশে গিয়ে বিশেষ করে ভারতের 'নিম্নবর্ণ'-এর মানুষকে এক নতুন কণ্ঠস্বর দান করতে পেরেছিল।

৩
কবীর-বাণীর বিশ্বভ্রমণ

কবীর-এর ভাবনা দুরূহ তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে থাকলেও তাঁর ভাষাব্যবহার খুবই সরল। আমাদের বাংলাভাষার চলন যেমন এক জেলা থেকে অন্য জেলায় পাল্টাতে পাল্টাতে যায়, হিন্দি ভাষাতেও ঠিক তেমনটাই আমরা দেখি। কবীর তাঁর বিভিন্ন ধরনের গীত বেঁধেছেন মধ্যযুগের চলিত হিন্দি ভাষায়, যা আজকের হিন্দির মির্জাপুরী ও গোরখপুরী উপভাষার খুব কাছের, এবং সন্দেহ নেই, তাঁর এই সরল ভাষাব্যবহারের জন্য তিনি যুগ-যুগ ধরে সাধারণ মানুষের অতি প্রিয়জন হয়ে থাকবেন। কবীর-এর মতো যাঁরা দারিদ্র্য ও অন্য নানা আর্থসামাজিক কারণে প্রথাগত লেখাপড়া শেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তাঁরাই কবীর-বাণীর সবচেয়ে নিবিড় শ্রোতা। কবীর তো খাতাকলম খুলে কিছু লেখেননি, তাঁত বুনতে-বুনতে তিনি ভাবতেন আর ভাবতে-ভাবতে গান বাঁধতেন, সেই গান মানুষকে ছুঁয়ে যেত, তাঁদেরই মুখে-মুখে ফিরত তাঁর দোঁহা। ক্রমে তাঁর অনুরাগী ও শিষ্যের সংখ্যা বাড়তে লাগল। অনুগামীদের

একটি নতুন নামকরণ হল, 'কবীর-পন্থী'। এঁরা না পুরোপুরি হিন্দু, না পুরোপুরি মুসলমান, অথবা কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলা যায়, এঁরা হিন্দুর চোখে হিন্দু, আর মুসলমানের চোখে মুসলমান, কিন্তু কখনোই হিন্দুর চোখে মুসলমান, আর মুসলমানের চোখে হিন্দু নন, প্রত্যেকেই শুদ্ধতম অর্থে মানবধর্মের উপাসক। কবীর-এর একটি বিশ্বখ্যাত দোঁহা এইরকম:

কবীর খাড়া বাজার মেঁ, মাঙ্গে সবকি খ্যার।
না কহু সে দোস্তি, না কহু সে ব্যার।।

শব্দার্থ : খ্যার>মঙ্গল; ব্যার> বৈরিতা

হায়, তাঁর এই সহজ-সুন্দর উক্তির থেকে কত দূরে আজ আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি, পরস্পরের সঙ্গে অবিরাম লাঠালাঠি, এবং যা আরও হীন বৃত্তি, পরস্পরের সঙ্গে লাথালাথি করে চলেছি! কবীর বলেছেন, কর্মের সঙ্গে কর্ম যুক্ত করো, ছেঁড়া সুতোর সঙ্গে গোটা সুতো যুক্ত করো, ওই দেখো, তাঁতিকে, কী উত্তমরূপে সে কী তাঁত বুনে চলেছে! এ-বাক্যই বা আমরা মন দিয়ে শুনলাম কই?

কবীর-বাণীর লিপিবদ্ধ রূপ গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু হয় ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে, কবীর-এর জীবনাবসানের প্রায় সাড়ে তিনশো বছর পর। স্বভাবতই, প্রথম উদ্যোগ যাঁরা নিয়েছিলেন তাঁদের কারুরই প্রথম প্রজন্মের কবীর-শিষ্যদের হাতে-তৈরি পাণ্ডুলিপি চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়নি, তাঁদের সকলকেই মূল পাণ্ডুলিপির নকল অথবা নকলের নকল দেখে কাজ করতে হয়েছে। আরও তিরিশ বছর পর, ১৮৯৮-এ, কবীর-এর অন্যতম প্রধান সংকলনগ্রন্থ, 'বীজক', তার পূর্ণাঙ্গ চেহারা পায়। রাজা বিশু নাথ সিং প্রমুখ সে-যুগের কবীর-সংরক্ষকদের সঙ্গে-সঙ্গে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন-এর অক্লান্ত পরিশ্রম স্মরণ করাও আমাদের কর্তব্য। তিনিও স্বতন্ত্র প্রচেষ্টায়, কবীর-পন্থীদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির নকল থেকে ১৯০৯/১৯১০-এ বাংলায় গদ্যানুবাদ-সহ একটি আকরগ্রন্থ শান্তিনিকেতন থেকে প্রকাশ করেন। ক্ষিতিমোহন-এর কাজ দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এতই মুগ্ধ হন যে সেগুলি থেকে ১০০টি গান বেছে নিয়ে তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করে ফেলেন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে জনৈকা ঈভে.লিন আন্ডারহিল-কৃত ভূমিকা-সহ রবীন্দ্রনাথ-এর অনুবাদগ্রন্থ 'ওয়ান হান্ড্রেড্ পোয়েম্স অফ্ কবীর' প্রকাশিত হয়। এর অল্প আগে, ১৯১৩-তে, এজ্‌রা পাউন্ড, কবীর-এর দশটি রচনার কালীমোহন ঘোষ-কৃত ইংরেজী অনুবাদ নিজের মতো করে ঢেলে সাজিয়ে সেগুলি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'মর্ডার্ন রিভউ'-তে প্রকাশ করেন। কবীর-এর আজকের আন্তর্জাতিক খ্যাতির নেপথ্যে রবীন্দ্রনাথ-এর অনুবাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। 'ওয়ান হান্ড্রেড্ পোয়েম্স'-এর পর কবীরকে আর কোনোদিন ফিরে তাকাতে হয়নি; 'বীজক'-এর উন্নততর সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে 'অনুরাগ সাগর'-

এর অনুবাদ, এবং যা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, পারসনাথ তিওয়ারী কর্তৃক সম্পাদিত 'কবীর-গ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হয়েছে। অনেক মরণোত্তর সম্মানে কবীর আজ সম্মানিত কিন্তু একটি সম্মান বাকিদের ম্লান করে দিয়েছে বলে মনে হয়; শিখধর্মের পবিত্রতম ধর্মগ্রন্থ 'গুরু গ্রন্থ সাহিব'-এ তাঁর রচনা স্থান পেয়েছে।

৪
দূরে এবং কাছে

কবীর-এর জীবন ঘিরে অগণিত অলৌকিক গল্পের ভিড়ে আমরা দিশাহারা বোধ করি। কবীর-বাণীর সারবত্তা বিচার না করে তাঁর ওপর দেবত্ব আরোপ করে, তাঁকে দূরে সরিয়ে রেখে, আমরা সন্তুষ্ট থাকতে চাই। অথচ, সবার চেয়ে অলৌকিক ঘটনাটি, সাড়ে তিনশো বছরের লম্বা ঘুমের পর কবীর-বাণীর জেগে-ওঠা, আমাদের আশ্চর্য করে না। তবু, তিনি রয়েছেন আমাদের নিকটে, কিছুটা আড়ালে হয়তো, কিন্তু দূরে নয়। তাঁর নিজের ভাষাতেই বলা যায়, লোকে বলে কবীর চলে গেছেন দূরে, যাঁরা অচঞ্চল, কেবল তাঁরাই জানেন প্রকৃত সত্য।

[আমপাতা, জানুয়ারি ২০২০]